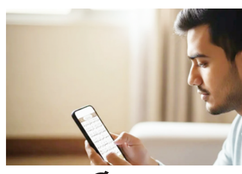

কঠিন রোগ থেকে মুক্তি পেতে যে দোয়া পড়বেন

ইসলাম ও জীবন ডেস্ক

নানা ধরনের প্রাণঘাতী ও দুরারোগ্য ব্যাধি মানুষের জীবনের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দেয়। ইসলামি বিশ্বাস অনুযায়ী, সুস্থতা ও অসুস্থতা উভয়ই মহান আল্লাহর ইচ্ছার অধীন। তাই রোগব্যাধি থেকে রক্ষা পেতে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা গ্রহণের পাশাপাশি আল্লাহর সাহায্য কামনার ওপরও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। হাদিসে এমন কিছু দোয়ার বর্ণনা পাওয়া যায়, যা কঠিন রোগ থেকে সুরক্ষা এবং রোগমুক্তির আশায় পাঠ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

কুষ্ঠ, ধবলসহ নানা ধরনের সংক্রামক ও দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে রক্ষা পেতে নবীজি (সা.) একটি বিশেষ দোয়া নিয়মিত পড়তে বলেছেন, 'আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা মিনাল বারাসি; ওয়াল জুনুনি; ওয়াল জুজামি; ওয়া সাইয়্যিয়িল আসক্বাম।'

অর্থ: 'হে আল্লাহ, আমি অবশ্যই তোমার কাছে ধবল (শ্বেতী), উন্মাদ (পাগলামি), কুষ্ঠরোগ এবং সব ধরনের কঠিন রোগ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।' (সুনানে আবু দাউদ)

উসমান ইবনে হুনাইফ (রা.) থেকে বর্ণিত, এক অন্ধ ব্যক্তি নবীজি (সা.)-এর কাছে এসে আরোগ্যের জন্য দোয়া চাইলেন। তখন রাসুল (সা.) তাকে উত্তমভাবে অজু করার নির্দেশ দিলেন এবং এই দোয়া পড়তে বললেন, 'আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা ওয়া আতাওয়াজ্জাহু ইলাইকা বিনাবিইয়িকা মুহাম্মাদিন নাবিইয়ির রাহমাহ, ইয়া মুহাম্মাদু ইন্নি তাওয়াজ্জাহতু বিকা ইলা রব্বি ফি হাজাতি হাজিহি লিতুকদ্বা লি, আল্লাহুম্মা ফাশাফফি'হু ফিইয়া।'

অর্থ: 'হে আল্লাহ, তোমার কাছে আমি প্রার্থনা করি এবং তোমার প্রতি মনোনিবেশ করি তোমার নবী, দয়ার নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর (দোয়ার) মাধ্যমে। (হে নবী!) আমি আপনার মাধ্যমে আমার প্রয়োজনের জন্য আমার প্রভুর দিকে ধাবিত হলাম, যাতে আমার এ প্রয়োজন পূর্ণ করে দেওয়া হয়। হে আল্লাহ! আমার প্রসঙ্গে তুমি তাঁর সুপারিশ কবুল করো।' (জামে তিরমিজি: ৩৫৭৮; মুসতাদরাকে হাকিম)।

ঈমানের সুরক্ষায় ইসলামের নির্দেশনা

ইসলাম ও জীবন ডেস্ক

ঈমান মানবজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। দুনিয়ার সব ধন-সম্পদ, ক্ষমতা ও সম্মান একদিকে আর ঈমান অন্যদিকে- তুলনায় ঈমানই অমূল্য। ঈমান ছাড়া মানুষের সব আমল নিষ্ফল, সব কৃতিত্ব অর্থহীন। একজন মুমিনের পরিচয়, মর্যাদা ও পরকালীন মুক্তির মূল চাবিকাঠি হলো ঈমান।

কিন্তু এই ঈমান অতি সংবেদনশীল ও পরিবর্তনশীল; কখনো তা বৃদ্ধি পায়, আবার কখনো দুর্বল হয়ে যায়। তাই ইসলাম শুধু ঈমান অর্জনের নির্দেশ দেয়নি, বরং ঈমান সংরক্ষণ, রক্ষা ও সুদৃঢ় করার জন্য সুস্পষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ নির্দেশনাও প্রদান করেছে।

আধুনিক যুগে শিরক, কুফর, বিদআত, নাস্তিকতা, ভোগবাদ, নৈতিক অবক্ষয় ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিভ্রান্তির যে স্রোত, তাতে ঈমান রক্ষা করা আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে কঠিন। এ প্রেক্ষাপটে

ইসলামের নির্দেশনাগুলো জানা ও বাস্তবায়ন করা অত্যন্ত জরুরি।

বিশুদ্ধ আকিদা ঈমান রক্ষার প্রথম শর্ত

ঈমানের ভিত্তি হলো সঠিক আকিদা। আকিদা যদি বিশুদ্ধ না হয়, তবে আমলের কোনো মূল্য নেই। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে শিরক করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন।' (সুরা : মায়িদা, আয়াত : ৭২)।

ইসলাম তাওহিদের আকিদাকে ঈমানের কেন্দ্রবিন্দু করেছে। আল্লাহর সত্তা, গুণাবলি, ইবাদত ও কর্তৃত্বে কাউকে শরিক না করা- এটাই ঈমানের মূল কথা। কবর পূজা, তাবিজ-কবচে বিশ্বাস, জ্যোতিষী বিদ্যা, ভাগ্য গণনা- এসব ঈমান ধ্বংসকারী বা দুর্বলকারী বিষয়। তাই ঈমান রক্ষায় প্রথম নির্দেশনা হলো শিরক থেকে পূর্ণ বিরত থাকা এবং সহিহ আকিদা শেখা ও ধারণ করা।

কোরআন ও সুন্নাহর সঙ্গে গভীর সম্পর্ক

কোরআন হলো ঈমানের প্রাণ, সুন্নাহ হলো তার বাস্তব রূপ। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'নিশ্চয়ই এই কোরআন এমন পথ নির্দেশ করে, যা সর্বাধিক সঠিক।' (সুরা : ইসরা/বনি ইসরাঈল, আয়াত : ৯)।

যে ব্যক্তি নিয়মিত কোরআন তিলাওয়াত করে, অর্থ বুঝে পড়ে, চিন্তা-গবেষণা করে এবং জীবনে বাস্তবায়ন করে- তার ঈমান দৃঢ় হয়। একইভাবে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাহ অনুসরণ ঈমান রক্ষার ঢালস্বরূপ। বিদআত ও মনগড়া আমল থেকে দূরে থাকাও ঈমান সুরক্ষার অন্যতম উপায়।

ফরজ ইবাদতে যত্নশীলতা

ইবাদত ঈমানকে শক্তিশালী করে আর গুনাহ ঈমানকে দুর্বল করে। নামাজ, রোজা, জাকাত, হজ- এসব ফরজ ইবাদত ঈমানের প্রহরী। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'বান্দা ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য হলো নামাজ।' (সহিহ মুসলিম)।

নামাজ ত্যাগ করলে ঈমান মারাত্মক ঝুঁকিতে পড়ে। নিয়মিত নামাজ, বিশেষ করে জামাতে নামাজ ঈমানকে জীবন্ত রাখে। রোজা আত্মসংযম শেখায়, জাকাত সম্পদের মোহ কাটায়, হজ তাওহিদের বাস্তব প্রশিক্ষণ দেয়- সব মিলিয়ে ফরজ ইবাদত ঈমান রক্ষার অপরিহার্য উপাদান।

গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা

গুনাহ ঈমানের বিষ। ছোট গুনাহ জমে বড় গুনাহে পরিণত হয় আর বড় গুনাহ ঈমান নিভিয়ে দেয়। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'মুমিন গুনাহ করলে তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে।' (তিরমিজি)।

চোখের গুনাহ, জিহ্বার গুনাহ, হারাম উপার্জন, সুদ, ঘুষ, ব্যভিচার, মিথ্যা- এসব ঈমান ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়। তাই ইসলাম ঈমান রক্ষার জন্য হারাম থেকে কঠোরভাবে বেঁচে থাকার নির্দেশ দিয়েছে।

তাওবা ও ইস্তিগফারের গুরুত্ব

মানুষ ভুল করে, গুনাহ হয়- এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তাওবা না করা মারাত্মক বিপদ। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'হে মুমিনরা! তোমরা সবাই আল্লাহর কাছে তাওবা করো।' (সুরা : নুর, আয়াত : ৩১)।

নিয়মিত ইস্তিগফার ঈমানকে ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করে। তাওবা ঈমানকে পুনরুজ্জীবিত করে, হৃদয়কে নরম করে এবং আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক দৃঢ় করে।

সৎ সঙ্গ বেছে নেওয়া

মানুষ তার বন্ধুর দ্বিনের ওপর থাকে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'তোমাদের প্রত্যেকের উচিত দেখা- সে কাকে বন্ধু বানাচ্ছে।' (আবু দাউদ)।

দ্বিনদার, তাকওয়াবান, আলেম ও সৎ লোকদের সঙ্গ ঈমান বাড়ায়। আর নাস্তিক, গুনাহগার ও ভ্রান্ত লোকদের সঙ্গ ঈমান ধ্বংস করে। তাই ঈমান রক্ষায় সৎ সঙ্গ বেছে নেওয়া অত্যন্ত জরুরি।

দুনিয়াপ্রীতি ও ভোগবাদ থেকে সতর্কতা

অতিরিক্ত দুনিয়াপ্রীতি ঈমানের সবচেয়ে বড় শত্রু। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'দুনিয়ার জীবন ধোঁকার সামগ্রী ছাড়া কিছুই নয়।' (সুরা : হাদিদ, আয়াত : ২০)।

সম্পদ, পদ, খ্যাতি যদি অন্তরে আসন গেড়ে বসে- তবে ঈমান দুর্বল হয়। ইসলাম দুনিয়া ত্যাগ করতে বলেনি, কিন্তু দুনিয়াকে অন্তরে জায়গা দিতে নিষেধ করেছে।

ইলম অর্জন ও অজ্ঞতা দূর করা

অজ্ঞতা ঈমানের শত্রু। সহিহ ইলম ছাড়া মানুষ শিরক, বিদআত ও বিভ্রান্তিতে পড়ে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'ইলম অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ফরজ।' (ইবনে মাজাহ)।

কোরআন-হাদিসের সহিহ জ্ঞান ঈমান রক্ষার শক্ত ভিত তৈরি করে।

আল্লাহর ওপর ভরসা ও দোয়ার গুরুত্ব

তাওয়াক্কুল ঈমানের অংশ। দোয়া মুমিনের অস্ত্র। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব।' (সুরা : গাফির, আয়াত : ৬০)। রাসুলুল্লাহ (সা.) নিজেও দোয়া করতেন, 'হে অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী! আমার অন্তরকে তোমার দ্বিনের ওপর স্থির রাখ।' (তিরমিজি)।

ঈমানের নিরাপত্তা

ঈমান একবার অর্জন করলেই নিরাপদ- এমন নয়। ঈমান আজীবন পাহারা দিতে হয়। ইসলামের নির্দেশনাগুলো মূলত ঈমানকে রক্ষা করার জন্যই। বিশুদ্ধ আকিদা, ইবাদত, গুনাহ থেকে বাঁচা, তাওবা, ইলম, সৎ সঙ্গ ও আল্লাহর স্মরণ- এসবের সমন্বয়েই ঈমান সুরক্ষিত থাকে। আজকের ফিতনাপূর্ণ যুগে ঈমান রক্ষা করা কঠিন হলেও অসম্ভব নয়। প্রয়োজন শুধু আন্তরিকতা, সচেতনতা ও আল্লাহর সাহায্য কামনা। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে ঈমানের সঙ্গে জীবন ও ঈমানের সঙ্গে মৃত্যু দান করুন। আমিন।

সূরা ইয়াসিন

সূরা ইয়াসিন পবিত্র কোরআনের একটি ফলিতপূর্ণ সূরা। এটি কোরআনের ৩৬ নম্বর সূরা। এর আয়াত সংখ্যা ৮৩। সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ।

সূরা ইয়াসিনের বাংলা উচ্চারণ :

১.ইয়াসিন।
২. ওয়াল কোরআনিল হাকিম।
৩. ইন্নাকা লা-মিনাল মুরসালিন।
৪. আলা সিরাতিম মুসতাকিম।
৫. তানজিলাল 'আজিজির রাহিম।
৬.লিতুনজিরা কাওমাম্মা-উনজিরা আ-বাউহুম ফাহুম গা-ফিলুন।
৭. লাকাদ হাক্কাল কাওলু'আলাআকসারিহিম ফাহুম লা-ইউ'মিনুন।
৮. ইন্না- যা'আলনা-ফি আ'না-কিহিম আগলা-লান ফাহিয়া ইলাল আজকা-নি ফাহুম মুকমাহুন।
৯. ওয়া যা'আল না-মিম বাইনি আইদিহিম ছাদ্দাওঁ ওয়া মিন খালফিহিম ছাদ্দান ফাআগশাইনা-হুম ফাহুম লা-ইউবসিরুন।
১০. ওয়া ছাওয়াউন 'আলাইহিম আ-আনযারতাহুম আম লাম তুনজিরহুম লা-ইউ'মিনুন।
১১. ইন্নামা-তুনজিরু মানিত্তাবা'আজজিকরা ওয়া খাশিয়াররাহমা-না বিলগাইবি ফাবাশশিরহু বিমাগফিরাতিওঁ ওয়া আজরিন কারিম।
১২. ইন্না-নাহনু-নুহয়িল মাওতা-ওয়া নাকতুবুমা-কাদ্দামু ওয়া আ-ছা-রাহুম ওয়া কুল্লা শাইয়িন আহসাইনা-হু ফিইমা-মিম মুবিন।
১৩. ওয়াদরিব লাহুম মাছালান আসহা-বাল কারইয়াহ ; ইযযাআহাল মুরছালুন।
১৪. ইজ আরছালনা ইলাইলিমুছনাইনি,ফাকাজযাবু-হুমা-ফা'আজঝাজনা-বিছা-লিছিন ফাকালু-ইন্নাইলাউকুম মুরছালুন।
১৫. কা-লু-মাআনতুম ইল্লা-বাশারুম মিছলুনা-ওয়ামা-আনঝালার-রাহমা-নু-মিনশাইয়িন ইন আনতুম ইল্লা-তাকজিবুন।
১৬. কা-লু-রাব্বুনা-ইয়া'লামুইন্না-ইলাইকুম লামুরছালুন।
১৭. ওয়ামা-'আলাইনা-ইল্লাল বালাগুল মুবিন।
১৮. কা-লু-ইন্না-তাতাইয়ারনা বিকুম লাইল্লাম তানতাহু-লানার-জুমান্নাকুম ওয়ালা-ইয়ামাছ-ছান্নাকুম মিন্না-'আজ-বুন আলিম।
১৯. কা-লু-তাইরুকুম মা'আকুম আইন জুক্কিরতুম বাল আনতুম কাওমুম মুছরিফুন।
২০.ওয়াযা-আ মিন আকসাল মাদিনাতি রাজুলুইঁ ইয়াছ'আ- কা-লা ইয়া-কাওমিত্তাবি'উল মুরছালিন।
২১. ইত্তাবি'উ মাল্লা-ইয়াছ-আলুকুম আজরাওঁ ওয়া হুম মুহতাদুন।
২২. ওয়া মা-লিইয়ালা-আ'বুদুল্লাজি ফাতারানি ওয়া ইলাইহি তুর যা'উন।
২৩.আ-আত্তাখিজুমিন দুনিহি-আ-লিহাতান ইয়ুঁইউরিদনির রাহমানু-বিদু ররিল লা-তুগনি 'আন্নি শাফা-'আতুহুম শাইআওঁ ওয়ালা-ইউনকিজুন।
২৪. ইন্নি ইযাল্লাফি দালা-লিম্মুবিন।
২৫. ইন্নিআ-মানতু-বিরাব্বিকুম ফাছমা'উন।
২৬. কিলাদ খুলিল জান্নাতা কা-লা ইয়া-লাইতা কাওমি ইয়া'লামুন।
২৭.বিমা-গাফিরলি রাববি ওয়া যা'আলানি মিনাল মুকরামিন।
২৮.ওয়ামা-আনঝালনা-'আলা-কাওমিহি মিম বা'দিহি মিন জুনদিম মিনাছ-ছামাই-ওয়ামা-কুন্নামুনজিলিন।
২৯. ইন কা-নাত ইল্লা-সাইহাতাওঁ ওয়া-হিদাতান ফাইযা-হুম খা-মিদুন।
৩০.ইয়া-হাছরাতান 'আলাল 'ইবা-দ, মা-ইয়া'তিহিম মির রাসুলিন ইল্লা-কা-নুবিহি ইয়াছতাহজিউন।
৩১.আলাম ইয়ারাও কাম আহলাক-না- কাবলাহুম মিনাল কুরুনি আন্নাহুম ইলাইহিম লাইয়ারজি'উন।
৩২. ওয়া-ইন কুল্লুল লাম্মা-যামি'উল লাদাইনা-মুহদারুন।
৩৩. ওয়া আইয়াতুল লাহুমুল আরদুল মাইতাতু আহইয়াইনা-হা-ওয়াআখরাজনা-মিনহাহাব্বান ফামিনহু ইয়া'কুলুন।
৩৪. ওয়া যা-আল না-ফিহা-জান্না-তিম মিন নাখিলিওঁ ওয়া আ'না-বিও ওয়া ফাজ্জারনা-ফিহামিনাল 'উইউন।
৩৫. লিয়াকুলু মিন্ ছামারিহি অমা 'আমিলাৎহু আইদিহিম; আফালা-ইয়াশ্কুরুন।
৩৬. ছুবহা-নাল্লাজি খালাকাল আঝাওয়া-যা কুল্লাহা- মিম্মা-তুমবিতুল-আরদু-ওয়া মিন আনফুছিহিম ওয়া মিম্মা-লা-ইয়া'লামুন।
৩৭.ওয়া ইয়াতুল্লাহুমুল্লাইলু নাছলাখু-মিনহুন্নাহারা ফাইযা-হুম মুজলিমুন।
৩৮. ওয়াশ-শামছু-তাজরিলি-মুছতাকাররিল লাহা-যা-লিকা তাকদিরুল 'আজিজিল 'আলিম।
৩৯. ওয়াল কামারা কাদ্দারনা-হুমানা-ঝিলা হাত্তা-'আ-দাকাল 'উরজুনিল কাদিম।
৪০.লাশশামছু-ইয়ামবাগি লাহা-আন তুদরিকাল কামারা ওয়ালাল্লাইলু-ছা-বিকুন্নাহা-রি ওয়া কুল্লুন ফি ফালাকিইঁ ইয়াছবাহুন।
৪১. ওয়াআ- ইয়াতুল লাহুম আন্না-হামালনা-যুররি-ইয়াতাহুম ফিল ফুলকিল মাশহুন।
৪২.ওয়া খালাক-না-লাহুম মিম মিছলিহি মা ইয়ার-কাবুন।
৪৩.ওয়া ইন্না-শা' নুগরিকহুম ফালা-ছারিখা লাহুম ওয়ালা-হুম ইউন-কাজুন।
৪৪. ইল্লা-রাহমাতাম মিন্না -ওয়া মাতা-'আন ইলা-হিন।
৪৫. ওয়া ইয়া-কিলা লাহুমুত্তাকু মা- বাইনা আইদিকুম ওয়ামা- খালফাকুম লা'আল্লাকুম তুরহামুন।
৪৬. ওয়ামা-তা'তিহিম মিন আ-য়াতিম মিন আ-য়া-তি রাব্বিহিম ইল্লা-কা-নু'আনহা-মু'রিদিন।
৪৭. ওয়া ইয়া-কিলা লাহুম আনফিকু-মিম্মা-রাঝাকাকুমুল্লা-হু কা-লাল্লাজিনা কাফারু লিল্লাজিনা আমানু আনুত'ইমু-মাল্লাও ইয়াশাউল্লা-হু আত'আমাহু ইন আনতুম ইল্লা-ফি দালা-লিম মুবিন।
৪৮.ওয়া ইয়াকুলুনা মাতা-হা-যাল ওয়া'দুইন কনতুম সা-দিকিন।
৪৯. মা-ইয়ানজু রুনা ইল্লা সাইহাতাওঁ ওয়া-হিদাতান তা'খুজুহুম ইয়াখিসসিমুন।
৫০. ফালা-ইয়াছতাতি'উনা তাওছিয়াতাওঁ ওয়ালাইলাআহলিহিম ইয়ারজি'উন।হিম্

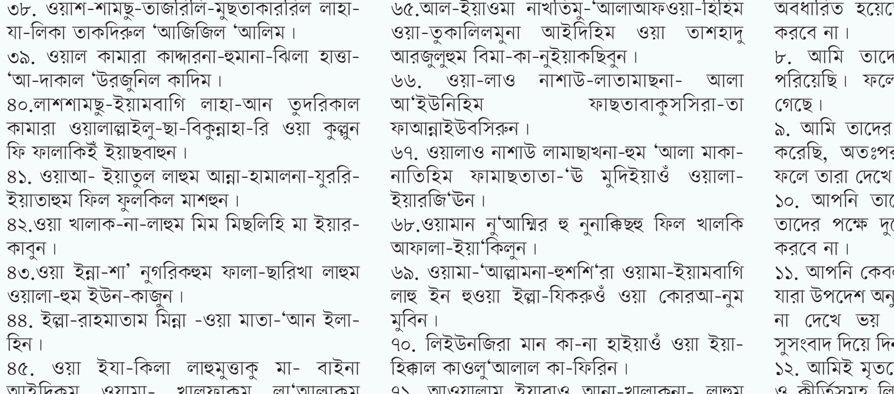

ইর্যাজ্বি'উন।
৫১.ওয়ানুফিখা ফিসসূরি ফাইযা-হুম মিনাল আজদা-ছি-ইলা-রাব্বিহিম ইয়ানছিলুন।
৫২. কা-লুইয়া-ওয়াইলানা-মাম বা'আছানা-মিম মারকাদিনা-হা-যা-মা-ওয়া'আদার রাহমা-নু-ওয়া সাদাকাল মুরছালুন।
৫৩. ইন কা-নাত ইল্লা-সাইহাতাওঁ ওয়া-হিদাতান ফাইযা-হুম যামি'উল লাদাইনা-মুহদারুন।
৫৪. ফাল-ইয়াওমা লা-তুজলামু-নাফছুন শাইয়াওঁ ওয়ালা-তুজঝাওনা ইল্লা-মা-কুনতুম তা'মালুন।
৫৫. ইন্না আসহা-বাল জান্নাতিল ইয়াওমা ফি শুগুলিন ফা-কিহুন।
৫৬. হুম ওয়া আঝওয়া-জুহুম ফি জিলা-লিন 'আলাল আরাইকি মুত্তাকিউন।
৫৭.লাহুম ফিহা-ফা-কিহাতুওঁ ওয়া লাহুম মা-ইয়াদ্দা'উন।
৫৮.ছালা-মুন কাওলাম মির-রাব্বির রাহিম।
৫৯. ওয়াম তা-ঝুল ইয়াওমা আইয়ুহাল মুজরিমুন।
৬০.আলাম আ'হাদ ইলাইকুম ইয়া-বানিআ-দামা আল্লা-তা'বুদুশশাইতান ইন্নাহু-লাকুম 'আদুওউম মুবিন।
৬১. ওয়া আনি'বুদু নী হা-যা-সিরা-তুম মুছতাকিম।
৬২. ওয়া-লাকাদ আদাল্লা মিনকুম জিবিল্লান কাছিরা- আফালাম তাকুনূতা'কিলুন।
৬৩. হা-জিহি জাহান্নামুল্লাতি কুনতুম তু'আদুন।
৬৪.ইসলাওহাল ইয়াওমা বিমা-কুনতুম তাকফুরুন।
৬৫.আল-ইয়াওমা নাখতিমু-'আলাআফওয়া-হিহিম ওয়া-তুকালিলমুনা আইদিহিম ওয়া তাশহাদু আরজুলুহুম বিমা-কা-নুইয়াকছিবুন।
৬৬. ওয়া-লাও নাশাউ-লাতামাছনা- আলা আ'ইউনিহিম ফাছতাবাকুসসিরা-তা ফাআন্নাইউবসিরুন।
৬৭. ওয়ালাও নাশাউ লামাছাখনা-হুম 'আলা মাকা-নাতিহিম ফামাছতাতা-'উ মুদিইয়াওঁ ওয়ালা-ইয়ারজি'উন।
৬৮.ওয়ামান নু'আম্মির হু নুনাক্কিছহু ফিল খালকি আফালা-ইয়া'কিলুন।
৬৯. ওয়ামা-'আল্লামনা-হুশশি'রা ওয়ামা-ইয়ামবাগি লাহু ইন হুওয়া ইল্লা-যিকরুওঁ ওয়া কোরআ-নুম মুবিন।
৭০. লিইউনজিরা মান কা-না হাইয়াওঁ ওয়া ইয়া-হিক্কাল কাওলু'আলাল কা-ফিরিন।
৭১. আওয়ালাম ইয়ারাও আন্না-খালাকনা- লাহুম মিম্মা- 'আমিলাত আইদিনা-আন'আ-মান ফাহুম লাহা-মা-লিকুন।
৭২.ওয়া জাল্লালনা-হা-লাহুম ফামিনহা-রাকুবুহুম ওয়া মিনহা-ইয়া'কুলুন।
৭৩. ওয়া লাহুম ফিহা-মানা-ফি'উ ওয়া মাশা-রিবু আফালা-ইয়াশকুরুন।
৭৪.ওয়াত্তা-খাজু-মিন দুনিল্লা-হি আ-লিহাতাল লা'আল্লাহুম ইউনসারুন।
৭৫. লা-ইয়াছ-তাতী'উনা নাসরাহুম ওয়াহুম লাহুম জুনদুম মুহদারুন।
৭৬.ফালা-ইয়াহ-ঝুনকা কাওলুহুম; ইন্না-না'লামুমা-ইউছিররুনা ওয়ামা-ইউ'লিনুন।
৭৭. আওয়ালাম ইয়ারাল ইনছা-নুআন্না-খালাকনা-হু-মিন-নুতফাতিন ফা-ইযাহুওয়া খাসিমুম মুবিন।
৭৮.ওয়া দারাবা লানা-মাছালাওঁ ওয়া নাছিয়া খালকাহু কা-লা মাইঁ ইউহয়িল 'ইযা-মা ওয়া হিয়া রামিম।
৭৯. কুল ইউহয়ী হাল্লাজি আনশাআহা আওওয়ালা মাররাতিওঁ ওয়া হুয়া বিকুল্লি খালকিন 'আলিমু।
৮০.আল্লাজি জা'আলা লাকুম মিনাশশাজারিল আখদারি না-রান ফাইজা-আনতুম মিনহু তুকিদুন।
৮১.আওয়া লাইছাল্লাজি খালাকাছছামা-ওয়াতি ওয়াল আরদা বিকা-দিরিন 'আলা আইঁ ইয়াখলুকা মিছলাহুম বালা- ওয়া হুওয়াল খাল্লা-কুল 'আলিম।
৮২. ইন্নামাআমরুহু ইজাআরা-দা শাইআন আইঁ ইয়াকুলা লাহুকুন ফাইয়াকুন।
৮৩. ফাছুবহা-নাল্লাজি বিয়াদিহি মালাকুতুকুল্লি শাইয়িওঁ ওয়া ইলাইহি তুর জা'উন।
(মাখরাজসহ উচ্চারণ শিখে নেওয়া জরুরি)।

সূরা ইয়াসিনের বাংলা অর্থ :

১. ইয়া-সিন।
২. প্রজ্ঞাময় কোরআনের কসম।
৩. নিশ্চয়ই আপনি প্রেরিত রাসুলগণের একজন।
৪.সরল পথে প্রতিষ্ঠিত।
৫.কোরআন পরাক্রমশালী পরম দয়ালু আল্লাহর তরফ থেকে অবতীর্ণ।
৬.যাতে আপনি এমন এক জাতিকে সতর্ক করেন, যাদের পূর্ব-পুরুষগণকেও সতর্ক করা হয়নি। ফলে তারা গাফেল।
৭. তাদের অধিকাংশের জন্য শাস্তির বিষয় অবধারিত হয়েছে। সুতরাং তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না।
৮. আমি তাদের গর্দানে চিবুক পর্যন্ত বেড়ি পরিয়েছি। ফলে তাদের মস্তক ঊর্ধ্বমুখী হয়ে গেছে।
৯. আমি তাদের সামনে ও পিছনে প্রাচীর স্থাপন করেছি, অতঃপর তাদের আবৃত করে দিয়েছি, ফলে তারা দেখে না।
১০. আপনি তাদের সতর্ক করুন বা না করুন, তাদের পক্ষে দুয়েই সমান; তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না।
১১. আপনি কেবল তাদেরই সতর্ক করতে পারেন, যারা উপদেশ অনুসরণ করে এবং দয়াময় আল্লাহকে না দেখে ভয় করে। অতএব আপনি তাদের সুসংবাদ দিয়ে দিন ক্ষমা ও সম্মানজনক পুরস্কারের।
১২. আমিই মৃতদের জীবিত করি এবং তাদের কর্ম ও কীর্তিসমূহ লিপিবদ্ধ করি। আমি প্রত্যেক বস্তু স্পষ্ট কিতাবে সংরক্ষিত রেখেছি।
১৩.আপনি তাদের কাছে সে জনপদের অধিবাসিদের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করুন, যখন সেখানে রসুল আগমন করেছিলেন।
১৪. আমি তাদের নিকট দুজন রাসুল প্রেরণ করেছিলাম, অতঃপর ওরা তাদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। তখন আমি তাদের শক্তিশালি করলাম তৃতীয় একজনের মাধ্যমে। তারা সবাই বলল, আমরা তোমাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছি।
১৫. তারা বলল, তোমরা তো আমাদের মতই মানুষ, রহমান কিছুই নাজিল করেননি। তোমরা কেবল মিথ্যাই বলে যাচ্ছ।
১৬. রাসুলগণ বলল, আমাদের পরওয়ারদেগার যানেন, আমরা অবশ্যই তোমাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছি।
১৭. পরিষ্কারভাবে আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেওয়াই আমাদের দায়িত্ব।
১৮. তারা বলল, আমরা তোমাদের অশুভ-অকল্যাণকর দেখছি। যদি তোমরা বিরত না হও, তবে অবশ্যই তোমাদের প্রস্তর বর্ষণে হত্যা করব এবং আমাদের পক্ষ থেকে তোমাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি স্পর্শ করবে।
১৯. রাসুলগণ বলল, তোমাদের অকল্যাণ তোমাদের সাথেই! এটা কী এজন্য, আমরা তোমাদের সদুপদেশ দিয়েছি? বস্তুত- তোমরা সিমালংঘনকারি সম্প্রদায় বৈ নও।
২০. অতঃপর শহরের প্রান্তভাগ থেকে এক ব্যক্তি দৌড়ে এলো। সে বলল, হে আমার সম্প্রদায় তোমরা রাসুলগণের অনুসরণ করো।
২১. অনুসরণ করো তাদের, যারা তোমাদের কাছে কোনো বিনিময় কামনা করে না, অথচ তারা সুপথ প্রাপ্ত।
২২. আমার কী হলো, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং যার কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে, আমি তাঁর এবাদত করব না?
২৩.আমি কী তাঁর পরিবর্তে অন্যদের উপাস্যরুপে গ্রহণ করব? করুণাময় যদি আমাকে কষ্টে নিপতিত করতে চান, তবে তাদের সুপারিশ আমার কোনোই কাজে আসবে না এবং তারা আমাকে রক্ষাও করতে পারবে না।
২৪. এরূপ করলে আমি প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় পতিত হব।
২৫.আমি নিশ্চিতভাবে তোমাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। অতএব আমার কাছ থেকে শুনে নাও।
২৬. তাকে বলা হলো, জান্নাতে প্রবেশ কর। সে বলল হায়, আমার সম্প্রদায় যদি কোন ক্রমে যানতে পারত।
২৭.যে আমার পরওয়ারদেগার আমাকে ক্ষমা করেছেন এবং আমাকে সম্মানিতদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।
২৮. তারপর আমি তার সম্প্রদায়ের ওপর আকাশ থেকে কোনো বাহিনী অবতীর্ণ করিনি এবং আমি (বাহিনী) অবতরণকারিও না।

কারবালা-ট্র্যাজেডি যেভাবে বদলে দেয় আরবের ভূরাজনীতি

ইসলাম ও জীবন ডেস্ক

৬১ হিজরির ১০ মহররম, ফোরাত নদীর তীরে কারবালার প্রান্তরে সপরিবারে শাহাদাত বরণ করেন মহানবীর দৌহিত্র ইমাম হোসাইন (রা.)। মুসলিম বিশ্বে এই ঘটনা আজও গভীর শোক ও আধ্যাত্মিক অনুভূতির সঙ্গে স্মরণ করা হয়। তবে ইতিহাসের দিক থেকে দেখলে, কারবালার ঘটনা কেবল একটি পারিবারিক শোকগাথা ছিল না। এটি উমাইয়া খেলাফতের বৈধতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছিল, আরবের ভেতরে পুরোনো গোত্রীয় বিভেদ উসকে দিয়েছিল এবং পরবর্তী কয়েক দশকে একাধিক রাজনৈতিক রূপান্তরের পথ তৈরি করেছিল।

উমাইয়া শাসনে বৈধতার সংকট

মুয়াবিয়া (রা.)-এর পর তাঁর পুত্র ইয়াজিদের ক্ষমতারোহণ আরবের রাজনৈতিক ইতিহাসে বংশানুক্রমিক শাসনের সূচনা করে। ইমাম হোসাইন (রা.) এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট নৈতিক অবস্থান নিয়েছিলেন। মদিনাবাসীরা ইয়াজিদের আনুগত্য অস্বীকার করে বিদ্রোহ ঘোষণা করে, যা ইতিহাসে হাররার যুদ্ধ নামে পরিচিত। উমাইয়ারা বিদ্রোহ দমন করতে পারলেও এই ঘটনা তাদের নৈতিক ভাবমূর্তিকে আরও দুর্বল করে দেয়।

কারবালার হত্যাকাণ্ডের পর নবীপরিবারের প্রতি এই নিষ্ঠুরতা সাধারণ মুসলিমদের মনে ক্ষোভ তৈরি করে এবং উমাইয়া শাসন একটি গভীর বৈধতার সংকটে পড়ে। এর প্রথম প্রকাশ্য বহিঃপ্রকাশ ঘটে মদিনায়।

মদিনাবাসীরা ইয়াজিদের আনুগত্য অস্বীকার করে বিদ্রোহ ঘোষণা করে, যা ইতিহাসে হাররার যুদ্ধ নামে পরিচিত। উমাইয়ারা বিদ্রোহ দমন করতে পারলেও এই ঘটনা তাদের নৈতিক ভাবমূর্তিকে আরও দুর্বল করে দেয়। (আকবর শাহ খান নাজিবাবাদি, তারিখুল ইসলাম, ২/১১৫, দারে ইহয়া আত-তুরাস আল আরবি, বৈরুত, ১৯৯৭)

মক্কা-মদিনার রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা

কারবালার পরবর্তী সময়ে আরবের ভূরাজনীতিতে সবচেয়ে দৃশ্যমান পরিবর্তন আসে হিজাজ অঞ্চলে। আবদুল্লাহ ইবনে জুবাইর (রা.) ইয়াজিদের শাসনকে অবৈধ ঘোষণা করে মক্কায় নিজের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। কারবালার ঘটনা সাধারণ মানুষের মধ্যে যে উমাইয়াবিরোধী মনোভাব তৈরি করেছিল, তা তাঁর পক্ষে হিজাজ, ইয়েমেন ও ইরাকের একটি উল্লেখযোগ্য অংশের সমর্থন আদায় করতে সহায়ক হয়।

এর ফলে আরবের ভূরাজনৈতিক কাঠামো কার্যত দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েড়একদিকে দামেস্কের উমাইয়া শাসন, অন্যদিকে মক্কাকেন্দ্রিক জুবাইরীয় নেতৃত্ব (ইবনে কাসির, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৮/২৫১, দারু হিজর, কায়রো, ১৯৯৮)।

কুফা ও তাওওয়াবুন আন্দোলন

কারবালার রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া সবচেয়ে তীব্রভাবে অনুভূত হয়েছিল ইরাকের কুফায়। কুফাবাসীরা ইমাম হোসাইনকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল, কিন্তু উমাইয়া গভর্নর ইবনে জিয়াদের চাপে তাঁরা শেষ পর্যন্ত তাঁকে সাহায্য করতে পারেননি। এই অনুশোচনা থেকে কুফায় 'তাওওয়াবুন' বা অনুশোচনাকারীদের আন্দোলন গড়ে ওঠে। সোলাইমান ইবনে সুরদ আল-খুজায়ির নেতৃত্বে উমাইয়া শাসনের বিরুদ্ধে এই আন্দোলন সংঘটিত হলেও সামরিকভাবে তা সফল হয়নি। (ইবনুল আসির, আল-কামিল ফিত তারিখ, ৩/৩৬২, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৯৮৭)। উমাইয়া শাসনের একটি মূল ভিত্তি ছিল আরবীয় গোত্রীয় সমর্থন। কিন্তু কারবালা-পরবর্তী রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে 'কালব' ও 'কায়েস'ড়এই দুই প্রধান গোত্রীয় জোটের মধ্যে পুরোনো শত্রুতা নতুনভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে। আন্দোলনটি ব্যর্থ হলেও ইরাক অঞ্চলে উমাইয়াবিরোধী রাজনৈতিক চেতনাকে স্থায়ী রূপ দিয়ে যায়। এর পর থেকে ইরাক উমাইয়া শাসনের জন্য একটি ক্রমাগত অস্থির অঞ্চলে পরিণত হয়।

অনারবদের রাজনৈতিক অন্তর্ভুক্তি

তাওয়াবুন আন্দোলনের পর কুফায় মোখতার আল-সাকাফির উত্থান ঘটে। মুখতার কারবালার জনমানসিক আবেগকে সংগঠিত রাজনৈতিক শক্তিতে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হন।

তাঁর শাসনকালের একটি উল্লেখযোগ্য দিক ছিল 'মাওয়ালি' বা অনারব মুসলিমদেরড়বিশেষত পারসিকদেরড়সেনাবাহিনী ও প্রশাসনে অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া। উমাইয়া শাসনে এই শ্রেণি ব্যাপকভাবে বৈষম্যের শিকার হতো।

মোখতারের এই পদক্ষেপ আরব-অনারব বিভেদের প্রশ্নটিকে রাজনৈতিক কেন্দ্রে নিয়ে আসে এবং পারস্যের জনগণকে উমাইয়াবিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। (ড. মুহাম্মদ সোহাইল তাক্কুশ, তারিখুল উমুবিইয়িন, ১/৮৭, দারুন নাফায়িস, বৈরুত, ১৯৯৫)

গোত্রীয় দ্বন্দ্বের পুনরুত্থান

উমাইয়া শাসনের একটি মূল ভিত্তি ছিল আরবীয় গোত্রীয় সমর্থন। কিন্তু কারবালা-পরবর্তী রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে 'কালব' ও 'কায়েস'ড়এই দুই প্রধান গোত্রীয় জোটের মধ্যে পুরোনো শত্রুতা নতুনভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে। ৬৪ হিজরিতে মার্জ রাহিতের যুদ্ধে এই দুই পক্ষের রক্তক্ষয়ী সংঘাত উমাইয়াদের অভ্যন্তরীণ সামাজিক ভিত্তিকে দুর্বল করে দেয়। (তাবারি, তারিখুর রুসুল ওয়াল মুলুক, ৫/৫৩৬, দারুল মাআরিফ, কায়রো, ১৯৬৭) কারবালার পর উমাইয়াদের যে বৈধতার সংকট শুরু হয়েছিল, সেই পটভূমিতে এই গোত্রীয় বিভেদ অনেক বেশি ধ্বংসাত্মক হয়ে ওঠে।

আব্বাসীয়রা তাদের আন্দোলনের মূল স্লোগান হিসেবে ব্যবহার করেছিল নবী-পরিবারের অধিকার পুনরুদ্ধারের দাবিকে। খোরাসান অঞ্চল থেকে শুরু হওয়া এই বিপ্লবে অনারব মুসলিমদের ব্যাপক অংশগ্রহণ ছিল।

আব্বাসীয় বিপ্লব, উমাইয়াদের পতন

কারবালা-পরবর্তী দীর্ঘ রাজনৈতিক পরিবর্তনের পরিণতি হিসেবে আসে ১৩২ হিজরিতে আব্বাসীয় বিপ্লব। আব্বাসীয়রা তাদের আন্দোলনের মূল স্লোগান হিসেবে ব্যবহার করেছিল নবী-পরিবারের অধিকার পুনরুদ্ধারের দাবিকে।

কোরআনের দৃষ্টিতে পণ্যে ভেজাল মেশানো

ইসলাম ও জীবন ডেস্ক

খাদ্যে ভেজাল কোটি কোটি মানুষকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। শিশুখাদ্যে ভেজাল সর্বনাশ করে গোটা একটি প্রজন্মের শরীর, জীবনীশক্তি, মেধা ও আয়ুর। স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞরা বলেন, ভেজাল এবং এক বা একাধিক রাসায়নিক দ্রব্য মেশানো খাবার খেলে মানুষের বুদ্ধি, চিন্তাশক্তি ও স্মরণশক্তি হ্রাস পায়। মানুষ মেধাহীন হয়ে পড়ে। শরীরের জিনজাত স্নায়ুকোষগুলোর আয়ুও এসব ভেজাল ও রাসায়নিক দ্রব্য মেশানো খাবার খাওয়ার ফলে কমে যায়। দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি, স্বাদ গ্রহণের শক্তি, ঘ্রাণ নেওয়ার ক্ষমতা হ্রাস পায়।

শরীরে বাসা বাঁধে মরণব্যাধি ক্যান্সারসহ নানা রোগ-ব্যাধি। ইসলামে পণ্যে ভেজাল প্রদান সম্পূর্ণরূপে হারাম। এ মর্মে কোরআনের দলিল নিম্নে আলোচিত হলো-

১. মহান আল্লাহ বলেন, 'শৃঙ্খলা স্থাপনের পর তোমরা পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি কোরো না।' (সুরা : আরাফ, আয়াত : ৫৬)

উক্ত আয়াতে সাধারণভাবে সব ফ্যাসাদ থেকে নিষেধ করা হয়েছে। (তাফসিরে কুরতুবি : ৭/২২৬)

তন্মধ্যে খাদ্যদ্রব্য বা পণ্যে ভেজাল প্রদান অন্যতম।

২. আল্লাহ বলেন, 'যখন সে ফিরে যায় (অথবা নেতৃত্বে আসীন হয়), তখন সে পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টির এবং শস্য ও প্রাণী বিনাশের চেষ্টা করে। অথচ আল্লাহ অশান্তি পছন্দ করেন না।' (সুরা : বাকারাহ, আয়াত : ২০৫)

উক্ত আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে যে পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অন্যতম রূপ হলো, মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করা। যার প্রভাব তাদের জীবন, সন্তান-সন্ততি, ফল-ফসল ও গবাদি পশুর ওপর গিয়ে পড়ে। এসব খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল প্রদানের ফলে ঘটে থাকে।

৩. মহান আল্লাহ বলেন, 'ন্যায্য কারণ ছাড়া কাউকে হত্যা করবে না, যা আল্লাহ হারাম করেছেন।' (সুরা : আনআম, আয়াত : ১৫১)

এ আয়াতে অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে, যেভাবেই তা হোক না কেন। আর খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল প্রদান ধীরে ধীরে মানুষকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয় বিধায় তা হারাম।

৪. মহান আল্লাহ বলেন, 'আর তোমরা অন্যায়ভাবে পরস্পরের সম্পদ ভক্ষণ কোরো না এবং অন্যের সম্পদ গর্হিত পন্থায় গ্রাস করার উদ্দেশ্যে তোমরা জেনেশুনে তা বিচারকদের কাছে পেশ কোরো না।' (সুরা : বাকারাহ, আয়াত : ১৮৮)

আয়াতটি দু'দিক থেকে খাদ্যে ভেজাল প্রদান হারাম হওয়ার প্রতি নির্দেশ করে-

ক. অন্যায়ভাবে যেকোনো পন্থায় মানুষের সম্পদ ভক্ষণ করতে আয়াতে নিষেধ করা হয়েছে। তন্মধ্যে খাদ্যে ভেজাল অন্যতম।

খ. ক্রেতা নির্ভেজাল ও নিরাপদ পণ্য ক্রয় এবং এর দ্বারা পরিপূর্ণরূপে উপকৃত হওয়ার জন্য বিক্রেতাকে সম্পূর্ণ মূল্য প্রদান করে। যদি পণ্যে ভেজাল থাকে তাহলে কখনো কখনো তা মূল্য কমে যাওয়ার কারণ হতে পারে। এভাবে ভেজাল প্রদানের ফলে পণ্যের মূল্য যতটুকু কম হবে ততটুকু বিক্রেতা ক্রেতার মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করেছে বলে গণ্য হবে।

৫. মহান আল্লাহ বলেন, 'হে বিশ্বাসীরা! তোমরা একে অপরের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণ কোরো না, তোমাদের পারস্পরিক সম্মতিতে ব্যবসা ছাড়া।' (সুরা : নিসা, আয়াত : ২৯) এ আয়াতও দুদিক থেকে উক্ত আয়াতটি ভেজাল হারাম হওয়ার দলিল বহন করে-

ক. যেকোনো পন্থায় অন্যায়ভাবে সম্পদ ভক্ষণ করা। পণ্যে ভেজাল প্রদান এর অন্যতম মাধ্যম।

খ. ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ হওয়ার অন্যতম শর্ত হলো সম্মতি। এমনকি কিছুসংখ্যক মালেকি বিদ্বান একে প্রথম রুকন হিসাবে গণ্য করেছেন। আর এটা স্বতঃসিদ্ধ যে পণ্য ক্রয়কারী ভেজাল ছাড়াই তা ক্রয় করতে সম্মত হয়। কেননা ভেজালে প্রতারণা ও ক্ষতি রয়েছে। তাই কোনো পণ্যে ভেজাল পরিদৃষ্ট হলে তা সম্মতিকে নষ্ট করে দেয়। অতএব প্রমাণিত হলো যে পণ্যে ভেজাল প্রদান হারাম।

৬. আল্লাহ বলেন, 'হে মুমিনরা! তোমরা (অবাধ্যতার

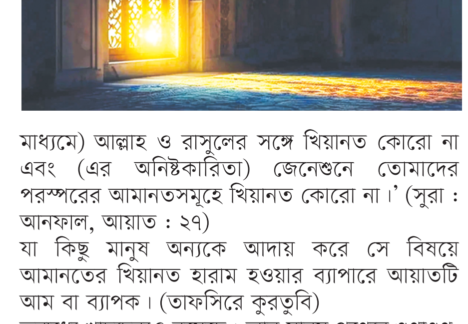

মাধ্যমে) আল্লাহ ও রাসুলের সঙ্গে খিয়ানত কোরো না এবং (এর অনিষ্টকারিতা) জেনেশুনে তোমাদের পরস্পরের আমানতসমূহে খিয়ানত কোরো না।' (সুরা : আনফাল, আয়াত : ২৭)

যা কিছু মানুষ অন্যকে আদায় করে সে বিষয়ে আমানতের খিয়ানত হারাম হওয়ার ব্যাপারে আয়াতটি আম বা ব্যাপক। (তাফসিরে কুরতুবি)

তন্মধ্যে খাদ্যদ্রব্যও রয়েছে। আর মানুষ পণ্যের গুণাগুণ, কার্যকারিতা, মাপ ও ওজন প্রভৃতি বিষয়ে কাউকে বিশ্বস্ত মনে না করলে তার কাছ থেকে তা ক্রয় করে তার দ্বারা উপকৃত হতে চাইবে না। পণ্যে ভেজাল প্রদান এর বিপরীত। কাজেই প্রমাণিত হলো যে পণ্যে ভেজাল প্রদান হারাম।

৭. মহান আল্লাহ বলেন, 'হে মুমিনরা! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সঙ্গে থাকো।' (সুরা : তাওবা, আয়াত : ১১৯)

আল্লাহ তাআলা সর্বাবস্থায় এবং সব কথা ও কাজে সত্যবাদিতা অবলম্বন করাকে আবশ্যক করেছেন। এটি এসব বিষয়ে মিথ্যা হারাম হওয়ার প্রমাণ বহন করে। পণ্যে ভেজাল প্রদানও এর অন্তর্ভুক্ত। কারণ মিথ্যা তথ্য প্রদানের মাধ্যমে ভেজাল জিনিস বাজারজাত করা হয়। এতে ক্রেতাকে ধোঁকা দিয়ে চড়ামূল্য হাতিয়ে নেওয়া হয়।

৮. আল্লাহ বলেন, 'দুর্ভোগ মাপে কম দানকারীদের জন্য। যারা লোকদের কাছ থেকে মেপে নেওয়ার সময় পূর্ণ মাত্রায় নেয় এবং যখন লোকদের মেপে দেয় বা ওজন করে দেয়, তখন কম দেয়।' (সুরা : মুতাফফিফিন, আয়াত : ১-৩) উক্ত আয়াতগুলো পণ্য আদান-প্রদানের সময় সঠিকভাবে তা মাপা ও ওজন করা আবশ্যক হওয়া এবং মাপে ও ওজনে কম দেওয়া হারাম হওয়ার প্রতি নির্দেশ করে। কারণ তা প্রতারণা।